কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ পঞ্চম অধ্যায়: অবিশ্বাস ও বিভ্রান্তি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৫. ৫. ২. ৫. তাবার্রুক বিষয়ক শিরক

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, আরবের মুশরিকদের মধ্যে তাবাররুক বিষয়ক শিরক বিদ্যমান ছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, কোনো নেককার মানুষের স্মৃতি বিজড়িত দ্রব্য বা স্থানকে স্বাভাবিক সম্মান দেখানো শিরক নয়। তবে যখন মানুষ উক্ত স্মৃতি বিজড়িত দ্রব্য বা স্থানকে বরকরতে উৎস বলে মনে করে, তার সামনে ‘চূড়ান্ত ভক্তি, বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করে’, উক্ত দ্রব্য বা দ্রব্যের মালিকের আত্মা থেকে কোনো নেক নযর আশা করে তখন তা শিরকে পরিণত হয়। তাবার্রুকের ক্ষেত্রে সুন্নাত পদ্ধতি পরিত্যাগ করে বিদ‘আত বা খেলাফে সুন্নাত পদ্ধতিতে তাবার্রুক করলে তা থেকে শিরকের মধ্যে নিপতিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

তাবার্রুকের সুন্নাত পদ্ধতি আমরা জানতে পারি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর প্রিয় সাহাবীগণের কর্ম থেকে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে সবচেয়ে মূল্যবন ও বরকতময় স্মৃতি ছিল পবিত্র কাবা ঘর এবং তৎসংশ্লিষ্ট হাজার আসওয়াদ, রুকন ইয়ামানী, মাকাম ইবরাহীম ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাজার আসওয়াদে চুম্বন করেছেন। এ চুম্বন আল্লাহর নির্দেশ ও ইবরাহীম (আঃ)-এর অনুসরণ-অনুকরণের চুম্বন, পাথর থেকে, বা পাথরের কারণে ইবরাহীম (আঃ) থেকে কোনো বরকত, দু‘আ, কল্যাণ ইত্যাদি পাওয়ার জন্য নয়। সাহাবীগণও কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুসরণ ও সুন্নাত পালনের জন্যই তা চুম্বন করেছেন, পাথর থেকে কিছু পাওয়ার জন্য নয়। উমার (রাঃ) হাজার আসওয়াদ চুম্বন কালে বলেন:

إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لا تَضرُّ وَلا تَنْفَعُ وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ

‘‘আমি জানি যে, তুমি পাথর মাত্র, কোনো ক্ষতিও করতে পার না, উপকারও করতে পার না, যদি না আমি দেখতাম যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তোমাকে চুম্বন করছেন, আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।’’[1]

‘মাকামে ইবরাহীম’ ইবরাহীম (আঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত বরকতময় পাথর। কুরআন কারীমে একে সুস্পষ্ট নিদর্শন বলা হয়েছে এবং এর পিছনে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং সাহাবীগণ কখনোই সালাত আদায় করা ছাড়া কোনো ভাবে এ পাথরকে সম্মান করেননি। কখনোই একে চুম্বন করেননি, পানি দিয়ে ধুয়ে তা পান করেননি বা অন্য কোনোভাবে একে সম্মান প্রদর্শন করেননি।

সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর দেখেন যে, তাবিয়ী যুগের কিছু নও মুসলিম মাকামে ইবরাহীমে হাত বুলাচ্ছেন। তাঁরা এভাবে বরকতময় স্মৃতি-বিজড়িত দ্রব্যটিকে সম্মান করছিলেন। তখন তিনি বলেন:

لَمْ تُؤْمَرُوا بِهذا إنما أُمِرْتُمْ بالصلاة

‘‘তোমাদেরকে এরূপ করতে নির্দেশ দেওয়া হয় নি, কেবলমাত্র সালাত আদায় করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’’[2]

সুন্নাত নির্দেশিত স্থানগুলি-হাজার আসওয়াদ ও রুকন ইয়ামানী ছাড়া পবিত্র কাবাগৃহের অন্য কোনো স্থান চুম্বন,

হাত বুলানো বা অন্য কোনোভাবে তাঁরা ‘তাবাররুকের’ চেষ্টা তাঁরা কখনো করেননি।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরাম তাঁর ওযুর পানি, গায়ের ঘাম, কফ, থুতু, মাথার চুল, ঝুটা খাবার বা পানি অথবা তাঁর দেওয়া যেকোনো উপহার গভীরতম ভালবাসা ও প্রগাঢ় ভক্তির সাথে গ্রহণ করেছেন ও সংরক্ষণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁদের এসকল কাজে বাধা দেননি, অনুমোদন করেছেন। পরবর্তী যুগের তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও অন্যান্য যুগের সকল বুজুর্গ ও রাসূল-প্রেমিক মুসলিম রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর স্মৃতি বিজড়িত যেকোনো দ্রব্যের প্রতি তাঁদের হৃদয়ের আবেগ ও ভালবাসা কখনো গোপন করেননি।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর পরে সাহাবীগণ কোনো সাহাবীর বা অন্য কোনো বুজুর্গের বা পূর্ববতী কোনো নবী-ওলীর স্মৃতি বিজড়িত কোনো দ্রব্যের প্রতি এধরনের আচরণ করেননি। তাবিয়ী বা তাবি-তাবিয়ীগণও কখনো কোনো সাহাবী, তাবিয়ী বা তাবি-তাবিয়ীর স্মৃতি বিজড়িত কোনো দ্রব্য বরকতের জন্য গ্রহণ ও সংরক্ষণ করেননি। আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, আববাস, ফাতিমা, হাসান, হুসাইন, বেলাল, ইবনু মাসঊদ (□) বা অন্য কোনো সাহাবীর কোনো স্মৃতি বিজড়িত দ্রব্যকে কোনো সাহাবী, তাবিয়ী বা তাবি-তাবিয়ী তাবাররুক হিসাবে গ্রহণ করেননি। অনুরূপভাবে, তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী বুজুর্গগণের ক্ষেত্রেও তাঁরা এ ধরনের কোনো আচরণ করেননি।[3]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর স্মৃতি বিজড়িত দ্রব্য যেমন মু’মিনের ভালবাসা ও ভক্তির বিষয়, তেমনি তাঁর স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলিও মুমিনের ভক্তি ও ভালবাসার স্থান। এক্ষেত্রে সাহাবীগণের রীতি ছিল তিনি যে স্থানে নামায পড়েছেন সে স্থানে নামায পড়া, যে স্থানে তিনি বিশ্রাম করেছেন সেখানে বিশ্রাম করা, যেখানে তিনি কিছুক্ষণ শয়ন করেছিলেন সেখানে কিছুক্ষণ শয়ন করা, যেখানে তিনি ইস্তিঞ্জা করেছেন সেখানে ইস্তিঞ্জা করা। এমনি যেখানে তিনি ফরয সালাত আদায় করেছেন সেখানে তাঁরা নফল সালাত আদায় করতেন না, বরং তিনি যে ওয়াক্তের সালাত আদায় করেছেন তাই সেখানে আদায় করার চেষ্টা করতেন। এমনকি তিনি হজ্জ-উমরার সফরে যেখানে সালাত আদায় করেছেন, সেখানে তাঁরা হজ্জ-উমরার সফরেই শুধু সালাত আ্দায় করতেন, অন্য সময়ে শুধু সেখানে সালাত আদায় করার জন্য যেতেন না। অর্থাৎ সাহাবীগণ তাবার্রুক করতেন হুবহু অনুকরণের মাধ্যমে। এ বিষয়ক হাদীসগুলি আমি আমার এহইয়াউস সুনান গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

শুধু দ্রব্য বা স্থানকে ভক্তি করা বা তার প্রতি অলৌকিক ভক্তি প্রকাশের প্রবণতা তাঁরা কঠোরভাবে আপত্তি করতেন। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, উমর ফারুক (রাঃ) তাঁর খিলাফতকালে এক সফরে কিছু মানুষকে দেখেন যে, তারা সবাই একটি স্থানের দিকে যাচ্ছে। তিনি প্রশ্ন করেন: এরা কোথায় যাচ্ছে? তাঁকে বলা হয়: ইয়া আমীরুল মু’মিনীন, এখানে একটি মসজিদ বা নামাযের স্থান আছে যেখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নামায আদায় করেছিলেন, এজন্য এরা সেখানে যেয়ে নামায আদায় করছে। তখন তিনি বলেন :

إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِمِثْلِ هَذَا، يَتَّبِعُوْنَ آثَارَ أَنْبِيَائِهِمْ فَيَتَّخِذُوْنَهَا كَنَائِسَ وَبِيَعاً. مَنْ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فِيْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ فَلْيُصَلِّ، وَمَنْ لاَ، فَلْيَمْضِ، وَلاَ يَتَعَمَّدُهَا.

“তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতেরা তো এই ধরনের কাজ করেই ধ্বংস হয়েছে। তারা তাদের নবীগণের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলি খুঁজে বেড়াত এবং সেখানে গীর্জা ও ইবাদতখানা তৈরি করে নিত। যদি কেউ যাত্রা পথে (রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর স্মৃতি বিজড়িত) এসব মসজিদে নামাযের সময়ে উপস্থিত হয় তাহলে সে সেখানে নামায আদায় করবে। আর যদি কেউ যাত্রাপথে অন্য সময়ে সেখানে উপস্থিত হয়, তাহলে সে না থেমে চলে যাবে। বিশেষ করে

এসকল মসজিদে নামায আদায়ের উদ্দেশ্য করবে না।’’[4]

শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রাহ) উমার (রাঃ)-এর এ বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন: ‘‘হযরত ওমার (রাঃ)-এর বর্ণনা মতে প্রমাণিত হয় যে, এই যুগে মানুষ যে সমস্ত নক্শাকৃত পাদুকা এবং হাতের ছাপ মারা পাথর বা এই জাতীয় কিছু কোন একস্থানে পুতিয়া প্রচার করে যে, ইহা অমুক বুযর্গের হাত বা পদচিহ্ন সম্বলিত বরকতময় পাথর। ফলে অজ্ঞ জনসাধারণ সেই পাথর যিয়ারত করার জন্য বহু দূর দূরান্ত হইতে আসে এবং সেখানে নযর নিয়ায করিয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার জন্য নিবেদন পেশ করে। নিঃসন্দেহে ইহা বিদ‘আত ও সুন্নাতের বরখেলাফ। শরীয়ত মোতাবেক যখন এই সমস্ত বস্তুগুলি যিয়ারত করা এবং উহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা সুন্নাতের পরিপন্থী তখন উহার নিকট দোআ করা, কাকুতি মিনতি করিয়া কান্নাকাটি করা এবং মনোবঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করা কোনমতেই তো জায়েয হইতে পারে না। বরং ইহা পরকালে মুক্তির ও নাজাতের পথকে বন্ধ করিয়া দেয়। .....

উল্লেখিত বস্তুসমূহ এবং উহা ছাড়া ইবাদতের আশায় সেখানে যাহা কিছু স্থাপিত করা হয়, উহা ভাঙ্গিয়া (ফেলা) ও উহার মূলোৎপাটন করা প্রতিটি মুসলমানের পক্ষে অপরিহার্য কতর্ব্য।’’[5]

তিনি আরো বলেন: ‘‘আমাদের বর্তমান যুগের মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করিলে হৃদয় ব্যথিত ও বিগলিত না হইয়া পারে না। আমরা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) নির্দেশিত সহজ সরল পথ পরিত্যাগ করিয়া নিয়ত গোমরাহীর পথে চলিতেছি। যে সমস্ত পাথর ও স্থানসমূহ বুযর্গগণের সাথে সম্পর্কিত উহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তাযীম তাকরীমে আত্মনিয়োগ করিয়াছি। শিরক ও বিদয়াতে লিপ্ত হইতে আমাদের অন্তর কোন সময় ভয়ভীতি অনুভব করে না। এই সমস্ত স্থান ও বস্তুসমূহকে নিজেদের কিবলাহ, মাকসুদ ও মনের আশা আকাঙ্খা পূরর্ণ হওয়ার একমাত্র উৎস মনে করিয়অ বহুদূর দূরান্ত হইতে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া সেইখানে আসিয়া লোকজন উপস্থিত হয়। নযর নেওয়া দিয়া মিষ্টান্ন বিতরণ করিয়া, সুগন্ধি ছড়াইয়া, আলো জ্বালাইয়া বুযর্গদের আত্মার সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করিতে থাকে। তেমনিভাবে এই সমস্ত লোক বুযর্গদের তাসববীহ, লাঠি, পাদুকা এবং অন্যান্য ব্যবহৃত জিনিসকেও ঐ বুযর্গের স্থলাভিষিক্ত মনে করে। ....

এই যুগে যদি কোন পীরের লাঠি, পাগড়ী, পাদুকা বা জামা কাপড় কিছু পায় তবে উহা অতি সম্মানের সাথে কোন উঁচুস্থানে সংস্থাপন করিয়া সেই স্থানটিকে যিয়ারত করার জন্য লোকজনকে আমন্ত্রণ জানাইয়া উহাকে দরগাহ শরীফে পরিণত করে। এই সমস্ত বস্তু সম্বন্ধে কোন কোন লোক প্রপাগান্ডা করিয়া বলিয়া থাকে, আমি অমুক বুযর্গের ব্যবহৃত পাদুকা দ্বারা এমন উপকার পাইয়াছি যাহা বর্তমান যুগের জীবিত বুযর্গদের নিকটও পাওয়া যায় না। ......

এই কপটতা এমন এক স্তরে দাঁড়ায় যে, বুযর্গগণ যখন তাহাকে এই জাতীয় শরীয়ত বিরোধী অন্যায় কাজ করা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে বলেন তখন তাহারা নানা প্রকার ওযর-আপত্তি, টাল-বাহান ও বুযর্গদের প্রতি মহববত পোষণের বাহানা অনুসন্ধান করিয়া বলিয়া থাকে- এই জাতীয় কথা আমরা তাহাদের প্রতি মহববতের দরুনই বলিয়া থাকি। পরে যখন এই কপটতার রোগ সীমা অতিক্রম করিয়া যায় তখন এই জাতীয় লোকেরা প্রকাশ্য শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যায়। যাহারা তাহাদের এই সমস্ত কাজে তাহাদিগকে বাধাদান করে তখন তাহারা বাধাদানকারীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করিয়া বলিতে থাকে- ইহারা আল্লাহর অলীদের মত ও পথের বিরোধী তাহাদের কাশফ কেরামত অস্বীকার করে। যেমন ইহূদীগণ হযরত ঈসা (আঃ)-কে হযরত ওযায়ের (আঃ)-এর অস্বীকারকারী ও বিরোধী এবং মুসলমানদেরকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর শত্রু ও বিরোধী বলিয়া প্রচার করিয়া

থাকে। এই পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট হযরত ঈসা (আঃ) এতটা অপরাধীই ছিলেন যে, তিনি হযরত ওযায়ের (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। মুসলমানদের অপরাধ- তাহারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর সন্তান বলিয়া মানে না।

মোট কথা প্রতিটি গোমরাহ সম্প্রদায়ই হিদায়াত প্রাপ্ত শরীয়তের অনুসারী লোকদিগকে পদে পদে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকে। এই প্রকার অপমান করার জন্যই তাহাদের বিরুদ্ধে জন সমাজে বলিয়া বেড়ায় যে, এই সমস্ত লোক অমুক অলীর বিরোধী ও শত্রু, তাহার মত ও পথকে ইহারা বিশ্বাস করে না। মক্কার মুশরিকগণও হুযূর (ﷺ) এবং সাহাবা কিরামদের সম্বন্ধে এমন সব কথা বলিত। তাহারা নবীবরকে (ﷺ) সাবী অর্থাৎ বেদ্বীন এবং মিল্লাতে ইবরাহীমের বিরোধী ও শত্রু বলিয়া লোক সমাজে বলিয়া বেড়াইত।’’[6]

শাহ ওয়ালি উল্লাহ আরো বলেন: ‘‘শয়তান আদম সন্তানদের আদিম ও অকৃত্রিম শত্রু। সে প্রতি যুগে প্রতি স্থানে প্রথমে কোন আল্লাহর বন্ধুর কবরকে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য সুনির্দিষ্ট করিয়া লয়। তারপর একমাত্র উপাস্য আল্লাহকে বাদ দিয়া পূজা-পার্বনের জন্য ঐ কবরটিকে প্রতিমা বা মূর্তিতে পরিণত করে। ইহার পর শয়তান তাহার সঙ্গী-সাথী ও অনুসারীদের মধ্যে জোর গলায় প্রচার করিতে আরম্ভ করে যে, যাহারা এই কবরের পূজা পার্বন, উহার পাশে ওরস ও মেলা করিতে বারণ করে তাহারা প্রকৃতপক্ষে এই বুযর্গের শত্রু। তাহারা এই বুযর্গকে অসম্মান করার এবং তাহার প্রাপ্য হক তাহাকে না দেওয়ার জন্যই এইরূপ করিতেছে। শয়তানের এই অপপ্রচারে উত্তেজিত হইয়া একদল অজ্ঞ ও ইলম বিবর্জিত লোক এই সমস্ত নিষেধাজ্ঞাকারীদের বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যায়। এমনকি তাহাকে হত্যা করিতেও দ্বিধাবোধ করে না। তাহাদের প্রতি কুফরী ফতওয়া দেয়, তাহাকে নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট জ্বালা-যন্ত্রণা দিতে বদ্ধপরিকর হয়। বাধা প্রদানকারীদের দোষ কি? তাহাদের দোষ হইল আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যে কাজ করার নির্দেশ দিয়াচেন তাহারা জন সাধারণকে সেই কাজ করার জন্য আহবান করেন। আর যে কাজ করা হইতে বিরত থাকিতে বলিয়াছেন- উহা করা হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করেন।’’[7]

৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় একটি বৃক্ষের নিচে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সাহাবীগণের বাইয়াত গ্রহণ করেন, যে বৃক্ষের কথা কুরআন কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে[8]। এ বৃক্ষ প্রসঙ্গে ইবনু উমর (রাঃ) বলেন: হুদাইবিয়ার সন্ধির বাইয়াতে রেদওয়ানের পরের বৎসর আমরা যখন উমরা পালনের জন্য আবার ফিরে আসলাম তখন আমাদের মধ্য থেকে দু’জন সাহাবীও ঐ গাছটির নিচে একত্রিত হয়নি। তা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ছিল।[9]

অন্য হাদীসে নাফে’ (রাহ) বলেন: কিছু মানুষ হুদাইবিয়ায় ‘বাইয়াতে রেদওয়ানের গাছ’ নামে কথিত গাছটির নিকট আসত এবং সেখানে সালাত আদায় করত। খলীফা উমর (রাঃ) এ কথা জানতে পারেন। তখন তিনি তাদেরকে কঠিন শাস্তির ভয় দেখান। পরে তিনি ঐ গাছটিকে কেটে ফেলতে নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশ মতো গাছটি কেটে ফেলা হয়।[10]

এ হাদীসটি উল্লেখ করে শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী বলেন: ‘‘ভবিষ্যতে যাহাতে শিরকের পথ চিরতরে বন্ধ হইয়া যায় তজ্জন্যই হযরত ওমর সেই গাছটি কাটিয়অ ফেলার নির্দেশ দিয়াছিলেন। এই বৃক্ষটির ন্যায় যাহা কিছু মূতি ও প্রতীমার শ্রেণীভুক্ত যাহার কারণে অসংখ্য ফেতনা ফাসাদ এবং বিদ‘আতের প্রচলন হইয়া রহিয়াছে এবং যাহার দরুন কঠিনতম বিপদাপদ প্রকাশ লাভ করিয়াছে উহার বেলায় হুকুম কি হইতে পারে?

হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাজের তুলনায় অন্যতম কৃতিত্বপূর্ণ কাজ হইল হুযূরে আকরাম (ﷺ)_এর মসজিদে দেরার, যে মসজিদ আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ইসলামের ক্ষতি সাধন করার পরামর্শ গৃহরূপে নির্মান করিয়াছিল- উহা জ্বালাইয়া দেওয়া। তিনি শিরক ও বিদআতের পথ রুদ্ধ করার মানসেই এই কাজ করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত মসজিদ, মন্দির কবরের উপরে তৈয়ার করা হয় অথবা স্মৃতিসৌধরূপে নির্মাণ করা হয় এবং যাহাকে কেন্দ্র করিয়া অহরহ শিরক ও বিদআতের স্রোত বহিয়া চলিতেছে উহা ধ্বংস করিয়া দেওয়া মসজিদে দেরার ধ্বংসের তুলনায় কোন অংশেই কম পুণ্যের কাজ নহে। ইসলাম এই সমস্ত মাটির সাথে মিশাইয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছে।

যে সমস্ত মিনার ও গম্বুজ মৃত বা শহীদ লোকের কবরের উপর স্থাপিত তাহাও ধ্বংস করিয়া দেওয়া আমাদের পক্ষে ওয়াজিব। কারণ হুযূর (ﷺ)_এর বিরোধিতা ও ইসলামের নাফরমানী করার উপর ভিত্তি করিয়াই উহার অস্তিত্ব এইগুলিতে বিরাজ করিতেছে। .... এই সৌধসমূহ ধুলিস্যাত করিয় দেওয়ার অকাট্য প্রমাণ হইল হুযুর (ﷺ)_এর পবিত্র বাণী। তিনি কবরের উপর সৌধ বা গম্বুজ নির্মাণ করিতে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন। যাহারা এই সমস্ত করে তাহাদের প্রতি লানত বর্ষণ করিয়াছেন। যে সমস্ত বিষয়বস্তুর প্রতি হুযুর (ﷺ) নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছেন এবং যাহাদের নির্মাতাকে তিনি অভিশপ্ত বলিয়াছেন- উহা দ্বিধাহীন চিত্তে যত শীঘ্র সম্ভব ধ্বংস করিয়া ফেলাই মুসলমানদের এক অপরিহার্য কর্তব্য। আবার যাহারা কবরের উপর বাতি জ্বালায়, আলোক সজ্জায় সজ্জিত করে, ঝাড় বাতি লটকায়, সুগন্ধি ছিটায়, আগরবাতি জ্বালায়- তাহাদের প্রতিও নবীয়ে আকরাম (ﷺ) অভিসম্পাত করিয়াছেন।

অতএব যে কাজ করায় হুযূর (ﷺ) অসন্তুষ্ট হইয়া লানত করিয়াছেন উহা কবীরা গোনাহ। ইহার উপর কেয়াস করিয়াই ওলামায়ে কিরাম ফতওয়া দিয়াছেন কবরের জন্য মোমবাতি বা প্রদীপের তৈল মানত করাও হারাম। কারণ এই জাতীয় মানত করাই পাপের কাজে মানত করা। কেহ যদি এই জাতীয় মানত করিয়া আদায় না করে তবে তাহার পাপ হইবে না। এই জাতীয় কবরের জন্য ওয়াকফ করাও জায়েয নহে। শরীয়ত মতে এতদপ্রকার মানত করা না জায়েয। এই সমস্ত বস্তুকে স্থায়িত্ব দেওয়া এবং উহার প্রচলন জারি রাখাও শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজ হিসেবে গণ্য।”[11]

ফুটনোট

[1] বুখারী, আস-সহীহ ২/৫৭৯; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৯২৫।
[2] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৩/৪১৬।
[3] দেখুন: শাতেবী, আল-ই’তিসাম ১/৪৮১-৪৮৫।
[4] ইবনু ওয়াদ্দাহ, আল-বিদাউ, ৪১-৪২, ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১/৫৬৯, শাতেবী, ইতিসাম ১/৪৪৮-৪৪৯।
[5] শাহ ওয়ালি উল্লাহ, আল-বালাগুল মুবীন, পৃ. ৩২-৩৩।
[6] শাহ ওয়ালি উল্লাহ, আল-বালাগুল মুবীন, পৃ. ৩৭-৪০।
[7] শাহ ওয়ালি উল্লাহ, আল-বালাগুল মুবীন, পৃ. ৪৩।
[8] সূরা (৪৮) ফাৎহ: ১৮ আয়াত।
[9] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১০৮০; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৬/১১৭-১১৮।

[10] ইবনু সা’দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ২/৭৬, ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৭/৪৪৮।

[11] শাহ ওয়ালি উল্লাহ, আল-বালাগুল মুবীন, পৃ. ৩৪-৩৫।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=13761

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন